সারে সারে কফিন আসছে, বাংলাদেশি শ্রমিকরা কি বিশ্বায়িত দুনিয়ার শ্রমদাস?

Prothom Alo

লিখেছেন ফারুক ওয়াসিফ (তারিখ: রবি, ২০০৯-০৪-১৯ ২০:৪৩)

ক্যাটেগরী: ব্লগরব্লগর

'খুঁজিয়া দেশের ভুঁই,/ ও মোর বিদেশি যাদু/ কোথায় রহিলি তুই।' পোড়োজমি, টি এস এলিয়ট

বড় যুদ্ধের শহীদ

পেটের যুদ্ধ বড় যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের শহীদেরা দলে দলে ঘরে ফিরছে। দেশে মরলে খাটিয়া পেত, বিদেশে মরায় কফিন পেয়েছে, বিমানের দোলায় চড়ে ফিরতে পেরেছে, এই যা সান্ত্বনা। এর আগেও লাঞ্ছিত-বহিষ্কৃত শ্রমিকদের রক্তাক্ত প্রত্যাবর্তন আমরা দেখেছি। এখন লাশ হওয়াও দেখতে হলো। গত সপ্তাহে এসেছে ৪২ জনের লাশ। বছরের প্রথম তিন মাসে এসেছে ৬৩৫ আর গত বছর এসেছে দুই হাজার ২৩৭ জনের মৃতদেহ। এগুলো সরকারি হিসাব। হিসাবের বাইরে আরও মৃত্যু থাকা অসম্ভব নয়। বড় বৃ পড়লে মাটি কেঁপে ওঠে, বিদেশ-বিভুঁইয়ে অসহায় অবস্থায় লাঞ্ছনা ও নির্যাতনে মরে যাওয়া এত স্বদেশি শ্রমিকের মৃত্যুতে জাতি কি কেঁপে উঠেছে? ইরাক যুদ্ধের সাত বছরে নিহত হয়েছে চার হাজার ২৭৪ জন মার্কিন সেনা। তাতেই কি কাঁপন মার্কিন সমাজে! আর কি অনড় অকম্পিত আমাদের মহাশয়েরা। টনক নামের একটা বস্তু নাকি কর্তাব্যক্তিদের থাকা লাগে, এত মৃত্যু দেখে সেই জিনিসটি কি সামান্যমাত্র নড়েছে? মাছের মায়ের নাকি পুত্রশোক থাকতে নেই। মাছপ্রিয় বঙ্গের ভ্রাতারা তাই কাঁদেনওনি, নড়েনওনি। ওই লাশগুলো তাই অনাদরে নেমেছে বিমান থেকে, অনাদরেই রওনা হয়েছে নিজ নিজ গ্রামের মেঠো পথে। এ দেশে সব মৃত্যু সমান নয়। তাই বলে কারও কান্না লোনা আর কারও কান্না কষা, তা তো নয়!

যার দান বেশি সে নয়, যার ভোগ বেশি সে-ই ভিআইপি

যুগটা বাজারের। বাজারে সবাই সমান নয়, তেমনি সব মরণও নয়। এখানে যার অবদান বেশি সে নয়, যে বেশি ভোগ করে সে-ই মর্যাদাবান-ক্ষমতাবান। খাপছাড়া শোনালেও কথাটা সত্যি। বাংলাদেশে এককভাবে প্রবাসী শ্রমিকেরাই সবচেয়ে বড় বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে তাঁরা সরকারিভাবে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা (পাঁচ বিলিয়ন ডলার) পাঠিয়েছে, যা ওই সময়ের বিদেশি সাহায্যের তিন গুণ এবং জিডিপির ৭.৭৩ শতাংশ। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এ অঙ্ক প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা (ছয় বিলিয়ন ডলার) ছাড়ায়। বেসরকারি পথে হুন্ডি ইত্যাদি দিয়ে আসা টাকা যোগ করলে অঙ্কটা আরও বাড়ে।

কিন্তু এ তথ্য দাবিয়ে রেখে ফাটানো হয় যে গার্মেন্ট মালিকেরাই সবেচেয়ে বেশি ডলার আনেন। গত বছরে গার্মেন্টস থেকে রেমিট্যান্স এসেছে সাত বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি। এই টাকার অর্ধেকই আবার ওই শিল্পের কাঁচামাল আমদানি বাবদ বিদেশেই ফেরত যায়। এ ছাড়া শৌখিন ভ্রমণ ও বিলাসী দ্রব্য ক্রয়সহ বহু পথে ওই খাতের আরও টাকা দেশছাড়া হয়। তা বাদ দিলেও এ খাতে আমরা পাচ্ছি ৩.৫ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে প্রবাসী শ্রমিকদের থেকে এসেছে ৬.৪ বিলিয়ন ডলার। এর পুরোটা থেকে যাচ্ছে, খাটছে ও অর্থনীতির আকার বাড়াচ্ছে। অথচ গার্মেন্ট মালিকদের সর্বোচ্চ সুবিধা দেওয়া হয়, আয়কর মওকুফ করা হয়, তাঁদের কারখানা পাহারা দেয় র‍্যাব, বিডিআর। আর্থিক মন্দার অজুহাতে তাঁদের আবদার মেনে ৬০০ কোটি টাকা তিপূরণ দেওয়া হয়, দেওয়া হয় জমি-ঋণ কত কী! অথচ বিশ্বমন্দার দিনে তিপূরণ পাওয়ার হক দেশের গার্মেন্ট শ্রমিক আর প্রবাসী শ্রমিকদেরই বেশি। গার্মেন্টস খাতের এহেন কদর বিজিএমইএর জন্য। তাদের নিজস্ব বাহিনী পর্যন্ত আছে, আছে এমপি-মন্ত্রী, সরকার। দরিদ্র কিছু গ্রামীণ আত্মীয়-পরিজন ছাড়া প্রবাসী শ্রমিকদের আর কেহ নাই। তাই রক্ত-ঘাম পানি করেও তাদের সেবায় বরাদ্দ কেবল কাঁচকলা!

‘আমি বন্দী কারাগারে...’

তাদের উপার্জনে ভাগ বসায় রিক্রুটিং এজেন্সি নামের নতুন মধ্যস্বত্বভোগী। এত দিয়ে-থুয়েও চাকরি নামের সোনার হরিণের খোঁজ সবাই পায় না, তাদের স্থান হয় বিদেশের কারাগার বা শ্রমশিবিরে। গত শনিবারও এ রকম একজন প্রতারিত শ্রমিক ইখতিয়ার মালয়েশিয়া থেকে লাশ হয়ে ফিরেছেন। মালয়েশিয়ায় তাঁর ঠাঁই হয় বন্দিশিবিরে, অতঃপর নির্মম প্রহার ও পোকামাকড়ের মতো মৃত্যু। আশির দশকের শেষে মুজিব পরদেশীর ‘আমি বন্দী কারাগারে...’ গানটি প্রবাসীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এতেই প্রমাণ, পরবাস তাদের কাছে কারাবাসের থেকে বেশি কিছু মনে হতো না।

অন্তহীন দুর্দশার অফুরান ফজিলত

তাই যার দুঃখ-যন্ত্রণার শেষ নেই, তারই নাম প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিক। তাদের অন্তহীন দুর্দশার গল্প কি কাউকে ব্যথিত ও লজ্জিত করে? যে শর্তযুক্ত বিদেশি সাহায্যের জন্য আমাদের অঢেল সুদ ও নানা ধরনের তি পুষতে হয়, সেই সাহায্যকারীদের আমরা ডাকি ‘দাতা’ বলে। দাতাদেশগুলোর হেজিপেজিরাও এখানে রাজকীয় অভ্যর্থনা পান। অথচ বিদেশি সাহায্যের তিন গুণ বেশি দিয়েও শ্রমিকেরা পায় চাকরের ব্যবহার। এদের বেশির ভাগই সেই কৃষকদের সন্তান, যাদের কল্যাণে দেশবাসী আজও খেতে পায়। তা করতে গিয়ে এই প্রাচীন জীবটি দিনকে দিন শুকিয়ে যায়, ভিটেমাটি হারায়। যতবারই গ্রামে গেছি, দেখেছি হাড্ডিসার, সামান্য বস্ত্র গায়, খাটতে খাটতে কুঁজো হওয়া কৃষকদের। এদের সন্তানেরাই ভিটামাটি বেচে ভাগ্য ফেরাতে বিদেশে পাড়ি জমায়। এবং তারা তাদের পিতা-পিতামহদের মতোই প্রকৃত দাতা। তাদের পাঠানো টাকায়ই যাবতীয় আমদানি হয়ে থাকে, শোধ করা হয় তথাকথিত দাতাদের ঋণ ও এর সুদ। এই খাতকে ঘিরে প্রায় ২০ লাখ লোকের প্রাইভেট সেক্টর গড়ে উঠেছে। গ্রামে নগদ টাকার যোগানও এরাই যোগায়। তাতে কর্মসংস্থান হয়। আজকাল গ্রামে গ্রামে যে খামার, পোল্ট্রি, ফিশারি ও পাকা বাড়ি-ঘর-বাজার উঠছে, তাতেও এদেরই ষোল আনা অবদান। তাদের টাকায় পরিবারের লোকজন জোত-জমি

বাড়ায়, কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি আসে। ব্যয়বহুল কৃষির যুগে চাষাবাদের বিকাশে রেমিট্যান্সের কাঁচা টাকার অবদান বিপুল।

পরিত্যক্ত ও দুঃখী এ তরুণরাই আমাদের সময়ের নায়ক

সাধারণত তরুণেরাই বিদেশে যায় এবং এদের বেশির ভাগেরই বয়স ১৫ থেকে ৩০। এরা রাষ্ট্রের পরিত্যক্ত সন্তান। এরা ভাল মতো শিক্ষার সুযোগ পায়নি। তাই আগের চেয়ে এখন অদক্ষ শ্রমিক যাওয়ার হার বেশি। যাওয়ার আগে বা প্রথম দফায় ফিরেই তারা বিয়ে করে। বিয়ের পর আবার চলে যায়। এদের স্ত্রীরা তাদের তরুণ স্বামীদের মতোই দুঃসহ ও নিঃসঙ্গ জীবন কাটায়। তার পরও রোজগেরে স্বামী তার হাতেই টাকা পাঠায় বলে পরিবারে ও গ্রামে ওই স্ত্রীরা আলাদা মর্যাদা ভোগ করে। তাদের ওপর হম্বিতম্বি কমে এবং তারাও ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায় এবং পরিবারের স্বাস্থ্য নিয়ে মনোযোগী হয়। বিদেশে শ্রমবাজার সৃষ্টিতেও তাদের অবদান অসামান্য। এদের সঞ্চিত টাকায়ই গ্রামীণ সমাজে গতি আসে আর গঞ্জ হয়ে যায় ছোটো শহর। এভাবে নগরায়ণেও এদের ভূমিকা চোখে পড়ার মতো। এতসব আয়োজনে জাতীয় উ পাদন বাড়ে এবং বেকারত্বের চাপ কমে। কিন্তু দেখার দৃষ্টি নেই বলে সব কৃতিত্ব চলে যায় এনজিওগুলোর কোলে। তারাই বাহবা পায় আর চাষার ঘরের সোনার সন্তানেরা পায় অপমান-নির্যাতন আর উপেক্ষা।

পরের ধনে পোদ্দারি

দেশের প্রায় ৫০-৬০ লাখ প্রবাসি শ্রমিকদের টাকা পাঠানোর সুবন্দোবস্ত পর্যন্ত সরকার করেনি। তাদের কর মওকুফ হয় না, কিন্তু তাদের ডলার দিয়েই এমপি-আমলাদের জন্য বিনা শুল্কে গাড়ি আসে। আইএলওর দাবি, রেমিট্যান্সের পাঁচ শতাংশ ওই সব শ্রমিকদের অধিকার রায় ব্যয় করতে হবে। আজকে শ্রমিকদের নিজস্ব সংস্থা থাকলে তার মাধ্যমে তারা বাজেট প্রণয়ন কিংবা সরকারি নীতি প্রণয়নের সময় চাপ প্রয়োগ করতে পারতো। অনু পাদনশীল সেনাবাহিনীরও নিজস্ব ব্যাংক থাকতে পারলে প্রবাসীদের তা থাকবে না কেন? সেই ব্যাংকে তারা টাকা জমা রাখত, ঋণ নিত এবং তাদের সঞ্চিত টাকায় বড় বড় বিনিয়োগ ও প্রকল্পও হতে পারত। কিন্তু যে লোকটি ৫-১০ বছরের জন্য

বাইরে থাকছে, যার সব সুতো ছিঁড়ে গেছে, সে কীভাবে দেশে ফিরে বড় কিছু করার চিন্তা করতে পারে? তাই বিদেশে খেয়ে না-খেয়ে জমানো টাকার সর্বোত্তম ব্যবহারের সুযোগ তাদের হয় না। কিন্তু তাদের ধনে পরের পোদ্দারি ভালই চলে।

তারা সার্বভৌমত্বহীন রাষ্ট্রের শ্রমদাস

এখানেই আমি গুরুতর একটি অভিযোগ তুলতে চাই। যে দেশের নাগরিকেরা বিদেশ-বিভুঁইয়ে হাজারে হাজারে অপঘাতে মরে, যাদের জীবন কেবলই 'দাসজীবনের' করুণ আখ্যান, সেই দেশ ও সেই রাষ্ট্র সার্বভৌম ও কার্যকর হয় কী করে? নাগরিকদের সঙ্গে এই শর্তেই রাষ্ট্রের চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক যে রাষ্ট্র সব নাগরিককেই সমান চোখে দেখবে এবং সবারই জীবনের সুরক্ষা, স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা এবং সম্পদ অর্জন ও জীবিকার নিরাপত্তা দেবে। এটাই সার্বভৌমত্বের গোড়ার কথা। প্রবাসী শ্রমিকদের বেলায় এর গুরুতর বরখেলাপ হয়েছে। রাষ্ট্র দেশে বা বিদেশে তাদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। তারা মারা যাচ্ছে অন্য দেশের মালিকের শোষণে ও পুলিশের নির্যাতনে। অর্থা অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌম মতা তাদের জীবন নিচ্ছে, শোষণ করছে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম মর্যাদার প্রতিফলন হয় তার নাগরিকদের সার্বভৌম অধিকারের মধ্যে দিয়ে। অথচ এ রাষ্ট্র বিদেশে তার নাগরিকদের অধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে অকেজো। তাহলে প্রশ্ন, এই রাষ্ট্র কার এবং তা কোন বিচারে কার্যকর? কার সার্বভৌমত্বের অধিকার এখানে রক্ষিত হয়, আর কার সার্বভৌম দাবি এখানে বাতিল হয়, তার নিরিখেই এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে। প্রবাসীদের লাশের মিছিল বলছে, রাষ্ট্র তাদের পাশে নেই। ঠিক যেমনটা ঘটছে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের বেলায়। তাদের রাষ্ট্র তাদের ত্যাগ করেছে। প্রবাসে আমাদের শ্রমিকদেরও আজ রোহিঙ্গা-দশা। কোনো দায়িত্বশীল রাষ্ট্র তার নাগরিকদের এমন অমানবিক পরিণতিতে উদাসীন থাকার অর্থ সেই রাষ্ট্র সার্বভৌম নয়, সেই রাষ্ট্র ব্যর্থ রাষ্ট্র। এ রকম অবস্থায়ই সেই রাষ্ট্রের গরিব নাগরিকেরা বিশ্বায়িত দুনিয়ার সুলভ শ্রমদাস বনে যায়, তারা হারায় স্বাধীন মানুষের আইনী অধিকার। এই শ্রমদাসদের রক্ত-মাংস খেয়েই বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের সৌধ আরো উঁচু হয়।

কিন্তু এটা আমাদের জাতীয় লাঞ্ছনা ও জাতীয় ট্র্যাজেডি। আমরা এর বিহিত চাই। আমরা মনে করি, সব মৃত্যুই সমান এবং সবার অশ্র“ই সমান লোনা। নওগাঁর পত্নীতলার মালয়েশিয়া ফেরত ইখতিয়ারের মা-বউ এই সত্য জানেন, কিন্তু মহাশয়েরা মনে হয় জানেন না।